শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

ড. অচিন্ত্যকুমার মাইতি

গ্রন্থতীর্থ

প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা

৬৫/৩এ, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা — ৭০০ ০৭৩

ভূমিকা

ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এক ব্যতিক্রমী চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তাঁর গৌরবোজ্জ্বল কর্মজীবনকে প্রায় দুটি সমপর্যায়ে ভাগ করা যায়। তাঁর কর্মজীবন ছিল মাত্র ২৮ বছরের। প্রথম চোদ্দো বছর কেটেছে শিক্ষা প্রাঙ্গণে আর বাকি চোদ্দো বছর কেটেছে রাজনীতির রঙ্গামঞ্চে। শিক্ষাই ছিল তাঁর জীবনের মূল আশ্রয়। শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর স্বচ্ছ ধারণা ছিল— 'যদি কেউ শিক্ষাদানের মতো পূণ্যকর্মকে রাজনৈতিক কুটিল উদ্দেশে নিয়োজিত করে, তবে তা হবে নিন্দনীয়।' জীবনে শিক্ষা ও রাজনীতি ক্ষেত্রে সম্ভাব্য প্রায় সব পদই তিনি অলংকৃত করেছিলেন। আবার নীতি ও বিবেকের প্রশ্নে প্রদেশের বা কেন্দ্রের মন্ত্রিত্ব ছাড়তে তিনি কোনোরূপ কুণ্ঠিত বোধ করেননি। ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের চেয়ে জনসেবার আকর্ষণই তাঁর বড়ো ছিল। মূলত কাশ্মীর সমস্যার প্রকৃত সমাধান খুঁজতে গিয়ে শ্যামাপ্রসাদকে আত্মাহুতি দিতে হয়েছে। এদিক থেকে বিচার করলে একথা নিঃসন্দেহে

বলা যায়, শ্যামাপ্রসাদ ছিলেন ভারতের বিপ্লববাদের সার্থক উত্তরসূরী ও নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর যোগ্য উত্তর সাধক। শ্যামাপ্রসাদের নিরাসক্ত, নির্লিপ্ত জীবন, তাঁর দেশপ্রীতি, লৌহকঠিন ব্যক্তিত্ব, পাণ্ডিত্য, চারিত্রিক দৃঢ়তা, সর্বোপরি তাঁর অনমনীয় মানসিকতার পাশাপাশি কোমল হৃদয়— এতগুলি গুণের সমন্বয় তাঁর ব্যক্তি জীবনকে সার্থক ও মহিমান্বিত করেছে এবং পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পথচলা ও প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।

জানুয়ারি, ২০১৩

ড. অচিন্ত্যকুমার মাইতি

সূচিপত্র

প্রথম পরিচ্ছেদ : দেশ ও পরিবেশ	১৩
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : জন্মস্থান ও বংশ পরিচয়	১৭
তৃতীয় পরিচ্ছেদ : শৈশব	২১
চতুর্থ পরিচ্ছেদ : কৈশোর	৩২
পঞ্চম পরিচ্ছেদ : যৌবন : ব্যক্তিত্বের বিকাশ	৩৮
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : শিক্ষা প্রাঙ্গণে শ্যামাপ্রসাদ	৪৫
সপ্তম পরিচ্ছেদ : রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে শ্যামাপ্রসাদ	৬৬
অষ্টম পরিচ্ছেদ : ব্যক্তিগত জীবন	১০২
নবম পরিচ্ছেদ : শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যুরহস্য	১১৯
জীবনপঞ্জি	১৪১

॥ প্রথম পরিচ্ছেদ ॥

দেশ ও পরিবেশ

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দী বাংলার বুকে এক নবজাগরণের কাল। এসময়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন রামমোহন, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বামী বিবেকানন্দ, স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ মনীষীরা, যাঁরা বাংলাদেশে ইংরেজ প্রবর্তিত বিদেশি শিক্ষাব্যবস্থাকে ত্যাগ করে বাংলা ভাষায় শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন করতে চেয়েছিলেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংরেজ শাসন এবং ইংরেজি শিক্ষা বাঙালির ভাবজীবন ও চিন্তাভাবনার মূলে চরম আঘাত হানল। আঘাত করল বাঙালির আচার-ব্যবহার, পুঞ্জীভূত অনাচার ও অজস্র বিধিনিষেধের আকর—ধর্মে এবং নাড়া দিল নানা প্রথাজীর্ণ, অবসাদগ্রস্ত, হাজারও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন বাঙালি সমাজকে। রামমোহন, বিদ্যাসাগর,

প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, প্যারীচাঁদ মিত্র, উমেশচন্দ্র ব্যানার্জি, কালীপ্রসন্ন সিংহ, আনন্দমোহন বসু প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে দেশের কথা নতুন করে চিন্তা করতে শুরু করে দিলেন এবং এক নতুন ভারতবর্ষ গড়ার সংকল্প করলেন। ফরাসি বিপ্লবের পর থেকে যে নবজাগরণের সৃষ্টি হয়েছিল তাতে, অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন তখনকার বঙ্গসন্তানরা।

রামমোহনের সময়ে দেশের অবস্থা কেমন ছিল, রামমোহন সম্পর্কে লেখা একটি প্রবন্ধে তা সুন্দরভাবে তুলে ধরেন রবীন্দ্রনাথ— 'শতশত বৎসর চলে গেল— ইতিহাসের পুরোগামিনী গতি হল নিস্তব্ধ, ভারতবর্ষের মনোলোকে চিন্তার মহানদী শুকিয়ে গেল। তখন দেশ হয়ে পড়ল স্থবির, আপনার মধ্যে আপনি সংকীর্ণ, তার সজীব চিত্তের তেজ আর বিকীর্ণ হয় না দূর-দূরান্তরে। শুকনো নদীতে যখন জল চলে না, তখন তলাকার অচল পাথরগুলো পথ আগলে বসে; তারা অসংলগ্ন, তারা অর্থহীন, পথিকদের তারা বিঘ্ন।' রামমোহনই চিন্তার এই শুকনো মহানদীতে বান ডেকে আনলেন। রামমোহন উপলব্ধি করেছিলেন যে, কুসংসকার, মানসিক জড়তা ও অন্ধবিশ্বাসের বাঁধন কেটে দেশ এগিয়ে যেতে পারে শুধু শিক্ষার আলোকে। আজ আমাদের ঘরের কোণে কোণে যে অজ্ঞানতা বাসা বেঁধেছে, তাকে দূর করতে পারে একমাত্র বিজ্ঞানমনস্কতা। সেই কারণেই প্রয়োজন আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষা।

১৮৫৭ সালে দুটি ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটল। একটি হল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন, অপরটি সিপাহি বিদ্রোহ। একটির উদ্দেশ্য হল শিক্ষাক্ষেত্রে জোয়ার আনা, অপরটির উদ্দেশ্য ছিল স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হবার পরে কলকাতায় উচ্চশিক্ষার জন্যে একাধিক প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে— সব প্রতিষ্ঠানেই বিজ্ঞানশিক্ষার সুযোগ মিলল। দেশে প্রতিষ্ঠিত হল একশো সত্তরটি

বিজ্ঞান শিক্ষার কলেজ, পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয় এবং বেশ কিছু ইঞ্জিনিয়ারিং ও কারিগরি বিদ্যালয়। দেশে যেমন শিক্ষার বিস্তার লাভ করল, তার পাশাপাশি শুরু হয়ে গেল এক অসম ব্যবস্থা। ভারতীয়দের মনে ক্ষোভের সঞ্চার হল। শিক্ষা-ব্যবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালি ব্রিটিশ সরকারের অপসারণ দাবি করল। উচ্চপদে ভারতীয়দের চাকরি দেবার ব্যাপারে ব্রিটিশ শাসকরা অনীহা প্রকাশ করল। শিক্ষা ও চিকিৎসা ক্ষেত্রে ইংরেজদের আধিপত্য রইল। ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে এক আলোড়ন পড়ে গেল এবং তাঁরা রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এর মোকাবিলা করার সিদ্ধান্ত নিলেন।

১৯০৬ সালের ৩১ মার্চ স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হলেন। ১৯০৬ থেকে ১৯১৪ পর্যন্ত টানা আট বছর উপাচার্য পদে আসীন ছিলেন। দীর্ঘ সাত বছর পর পুনরায় ১৯২১ সালের ৪ এপ্রিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হলেন। ১৯২৩ সালের মার্চ মাসে উপাচার্য পদে ইস্তফা দেন। আশুতোষ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য থাকাকালীন সময়টাকে বলা হয় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বর্ণযুগ। এই সময়ে বিশ্ববিদ্যালয় উন্নতির সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করে, বিশ্বের একটি অন্যতম বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিগণিত হয়। আশুতোষ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাসহ চারটি ভারতীয় ভাষায় এম এ পরীক্ষার প্রবর্তন করেন। বাংলায় এম এ পাঠক্রমে প্রথম পরীক্ষা নেওয়া হয় ১৯২০ তে। মোট পরীক্ষার্থী ছিল বারো জন। বাংলা ভাষায় এম এ পাস করা ছাত্রদের নিয়ে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় সেসময়ে নানা ব্যঙ্গ, নানা কটুক্তিমূলক প্রবন্ধ বের হয়েছিল। কিন্তু আশুতোষ পিছিয়ে পড়েননি। বাংলা ভাষাকে মর্যাদার আসনে বসানোর জন্যে তাঁর চেষ্টার অন্ত ছিল না। আশুতোষের মধ্যম পুত্র শ্যামপ্রসাদ ইংরেজিতে বি এ অনার্স নিয়ে

প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হন। আশুতোষ তাঁকে ইংরেজি বিষয়ে এম এ ক্লাসে ভরতি না করে বাংলা বিষয়ে এম এ ক্লাসে ভরতি করে দেন। স্নাতকোত্তর স্তরে মাতৃভাষার পাঠদানের ব্যাপারে আশুতোষের অসামান্য অবদানের কথা স্মরণ করে দীনেশচন্দ্র সেন বলেছিলেন—

'বঙ্গ সাহিত্যের আশ্রয় কল্পতরু স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের চেষ্টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ কক্ষের দ্বার বঙ্গভাষার জন্যে উন্মুক্ত হইয়াছে। নিজেকে আবিষ্কার করা থেকে বড়ো আবিষ্কার আর কিছু হতে পারে না। স্যার আশুতোষ আমাদিগকে ভাষা ও সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে সেই সুমহান আবিষ্কারের পথ প্রদর্শন করে জাতীয় ধন্যবাদের পাত্র হয়ে রইলেন।' আশুতোষের শিক্ষাচিন্তা-ভাবনা যখন দেশে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনল, শিক্ষিত লোকের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে, তখন এ বিষয়টি তদানীন্তন ইংরেজ সরকার ভালো নজরে দেখল না, নানাভাবে আশুতোষকে বিপর্যস্ত করতে লাগল। শেষের দিকে তাঁকে কতকগুলো শর্তসাপেক্ষে উপাচার্যের পদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত হল। এই সিদ্ধান্তে আশুতোষ কিছুটা বেদনাহত হলেন বটে কিন্তু ইংরেজদের কাছে মাথা নত করেননি। উপাচার্যের পদ তিনি প্রত্যাখ্যান করলেন।

ধীরে ধীরে পটপরিবর্তন হতে লাগল এবং সেই সঙ্গে সামাজিক চেহারা বদলাতে থাকে। একদিকে শিক্ষা-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন, অপরদিকে স্বদেশি আন্দোলন। এই সময়ে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের আবির্ভাব খুবই তাৎপর্যপূর্ণ, যাঁর গৌরবোজ্জ্বল কর্মজীবন প্রায় সমভাবে দুটি পর্যায়ে বিভক্ত। তাঁর আঠাশ বছরের কর্মজীবনের মধ্যে প্রথম চোদ্দো বছর কেটেছে শিক্ষা প্রাঙ্গণে আর পরবর্তী চোদ্দ বছর কেটেছে রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে।

॥ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ॥

জন্মস্থান ও বংশ পরিচয়

১৯০১ খ্রিস্টাব্দের ৬ জুলাই স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় পুত্র শ্যামাপ্রসাদের জন্ম হয় রসা রোড নর্থের বাড়িতে। বর্তমানে এটির ঠিকানা ৭৭এ, আশুতোষ মুখার্জি রোড, ভবানীপুর, কলকাতা। শ্যামপ্রসাদরা ছিলেন চার ভাই ও তিন বোন— রমাপ্রসাদ, শ্যামাপ্রসাদ, উমাপ্রসাদ, বামাপ্রসাদ এবং কমলা, অমলা ও রমলা। কমলা ভাই- বোনেদের মধ্যে সকলের বড়ো।

শ্যামাপ্রসাদের পূর্বপুরুষেরা সংস্কৃতে সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই বাংলা সাহিত্যে যথেষ্ট অবদান রেখে গেছেন। পূর্বপুরুষদের একজন হলেন বাংলায় রামায়ণ অনুবাদক কৃত্তিবাস ওঝার প্রপিতামহ নরসিংহ ওঝার এক ভাই—নাম রাম মুখোপাধ্যায়। নরসিংহ ওঝা রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে পূর্ব বাংলার (বর্তমান বাংলাদেশ) সোনার গাঁ ছেড়ে শান্তিপুরের কাছে ফুলিয়ায় এসে বসবাস